ভূমিকা

অভীষ্ট নিশানায় পৌছানোর জন্য যে প্রচেষ্টা চালানো হয় তাকে বলে উদ্দেশ্য। আর শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনার জন্য যে শিক্ষামূলক প্রচেষ্টা সম্পন্ন করা হয় তাকে বলে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য। বিশেষত শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যগুলিই শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি। এই ধরনের শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে পাঠক্রম উন্নয়নের কাজ সম্পাদন করা হয়। পাঠক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাধারণত উদ্দেশ্য তিন প্রকারের— বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য, শিক্ষকের উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য। শিক্ষকের উদ্দেশ্য ও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যকে একত্রে বলা হয় নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য (Instructional objectives)।

নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য ও শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য

নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য হল শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের শেষ ধাপ। শ্রেণিক্রম (hierarchy) অনুযায়ী উদ্দেশ্যগুলিকে সজ্জিত করলে সর্বোচ্চ ধাপে অবস্থান করে শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য এবং পরবর্তী ধাপগুলিতে ক্রমান্বয়ে থাকে শিক্ষার স্তরগত উদ্দেশ্য, বিষয় অনুযায়ী উদ্দেশ্য, শ্রেণিগত উদ্দেশ্য ও শেষ ধাপে অবস্থান করে নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের কাজ হল সুনির্দিষ্টভাবে শিক্ষার্থীর আচরণের মধ্যে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনা। বিশেষত নির্দেশনা প্রক্রিয়ায় (instructional process) এই প্রকারের উদ্দেশ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে এই উদ্দেশ্যগুলি শিক্ষণ এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দেশক হিসাবে কাজ করে। এমনকি প্রাসঙ্গিক (relevant) বিষয়বস্তু ও শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচনে, শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে (monitoring), যথার্থ মূল্যায়ন কৌশল প্রণয়নে এবং অন্যদের নির্দেশনার প্রয়োজনে নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যটি বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে। বস্তুতপক্ষে নির্দেশনার (instruction) ফলে 'প্রত্যাশিত আচরণের পরিবর্তন' যার ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয় তাকে বলে নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য। এই প্রকারের উদ্দেশ্য নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। বিদ্যালয়ের কার্যাবলি হল এই প্রকার উদ্দেশ্যের উৎস (source)। অন্যদিকে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য এমন কতকগুলি প্রচেষ্টা যার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির পরিমাপ করা সম্ভব। এরই ভিত্তিতে শিখনের ফলশ্রুতি নির্ধারণ করা হয় যা শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন নির্দেশ করে। প্রকৃত পক্ষে শিখন প্রচেষ্টাকে যখন ফলশ্রুতির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে বলে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য। শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য ও নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যের মধ্যে মূল পার্থক্যগুলি হল— (১) শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের ভিত্তি হল দর্শন এবং নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যের ভিত্তি হল মনোবিজ্ঞান। (২) শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য ব্যাপক আর নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য হল সংকীর্ণ। (৩) বিভিন্ন বিষয়ের একটি সাধারণ উদ্দেশ্য থাকতে পারে; কিন্তু

Scanned by CamScanner

বিভিন্ন বিষয়ের নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য বিভিন্ন। (৪) শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য দেখে নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য নির্ণয় করা সম্ভব। কিন্তু নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য দেখে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। (৫) 'চরিত্রগঠন' হল শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের উদাহরণ এবং 'ব্যক্তির চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়' হল নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যের উদাহরণ।

নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য হল শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের এমন একটি অন্তিম ধাপ যা সুনির্দিষ্ট এবং মনোবিজ্ঞানের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রকার উদ্দেশ্যের মূল নিশানা হল পূর্ব নির্ধারিত ইপ্সিত অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর বাঞ্ছিত আচরণের পরিবর্তন পরিমাপ করা বা সেই সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। এছাড়া কাঙ্ক্ষিত অন্তিম ফলের স্বরূপ নির্ণয় করা, নির্দেশনার অভিপ্রায় (purpose) শিক্ষার্থী বা অভিভাবককে জ্ঞাত করা, শিখনের পরিমাণ পরিমাপ করা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণাপ্রদান করে থাকে এই উদ্দেশ্যগুলি। তবে নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যেমন— (১) দক্ষতাভিত্তিক, (২) সময়ভিত্তিক, (৩) সাফল্যভিত্তিক এবং (৪) আচরণভিত্তিক। এদের মধ্যে দক্ষতাভিত্তিক উদ্দেশ্যকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়, যথা—জ্ঞানমূলক (cognitive), অনুভূতি মূলক (affective) এবং মনশ্চালকমূলক (psychomotor)। আবার সময়ভিত্তিক দিক থেকে দুইভাবে উদ্দেশ্যকে ভাগ করা যায়, যেমন— (১) তাৎক্ষণিক এবং (২) অন্তিম উদ্দেশ্য। অন্যদিকে সাফল্যভিত্তিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদ হল দুই ধরনের, যথা—(১) শ্রেণিকক্ষের নির্দশনামূলক উদ্দেশ্য এবং (২) ব্যক্তিসত্ত্বামূলক উদ্দেশ্য। শেষ শ্রেণিবিভাগটি অর্থাৎ আচরণভিত্তিক শ্রেণিবিভাগটি দুইভাগে বিভক্ত— (১) আচরণ সাপেক্ষ এবং (২) আচরণ বহির্ভূত উদ্দেশ্য। নিম্নে নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যের শ্রেণিবিভাগটি ছকের সাহায্যে দেখানো হল—

নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যের শ্রেণিবিভাগ

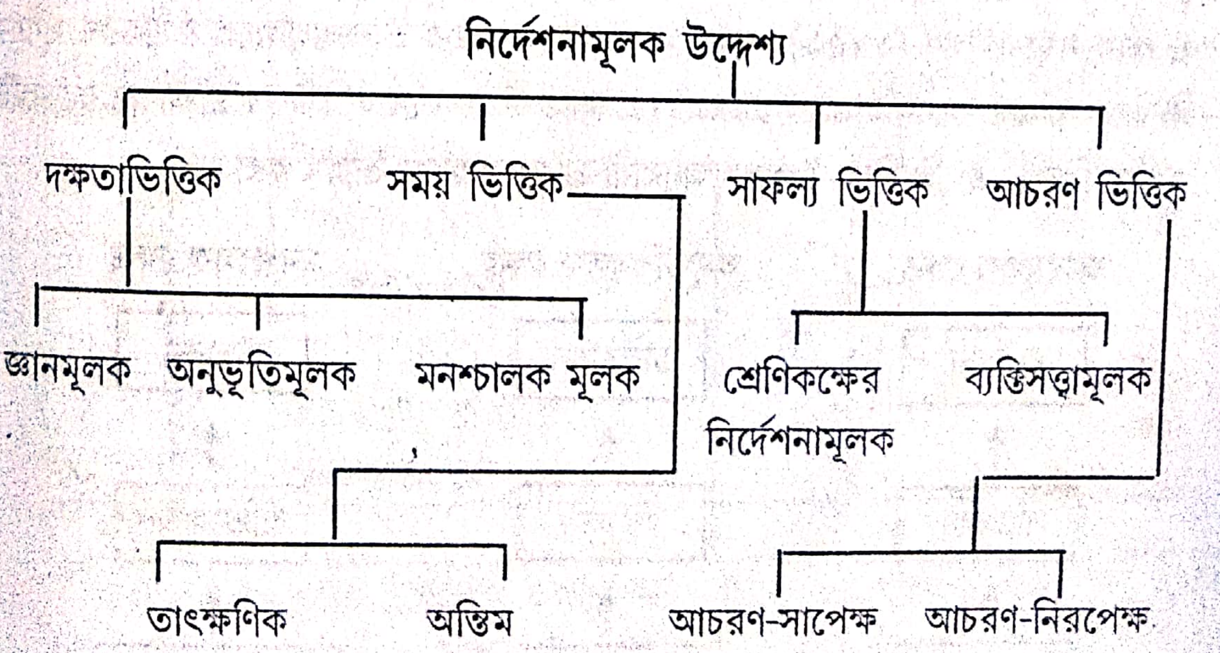

বর্গীকরণ কথাটির ইংরাজি প্রতিশব্দ হল Taxonomy। এই পদটি উদ্ভিদবিদ্যায় শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। তবে শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'Taxis' এবং

Scanned by CamScanner

'Nomas' কথা দুটির সমন্বয়ে। Taxis কথাটির অর্থ হল বিন্যস্ত বা সজ্জিতকরণ এবং Nomas শব্দটির অর্থ হল নিয়ম। সুতরাং দুটি কথার অর্থ একত্রে দাঁড়ায় বিন্যস্তকরণের জন্য সূত্র গঠন। উদ্ভিদবিজ্ঞানে বিন্যস্তকরণের নীতির উপর ভিত্তি করে যখন নির্দেশনার উদ্দেশ্যগুলিকে বিন্যস্ত করা হয়, তখন তাকে বলা হয় নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যের বর্গীকরণ (taxonomy of Instructional objectives)। ১৯৫৬ সালে এই উদ্দেশ্যে অধ্যাপক

নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যের বর্গীকরণ

B.S.Bloom (ব্লুম) ও তাঁর সহযোগী গবেষকগণ সর্বপ্রথম নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যের বর্গীকরণের ক্ষেত্রে এই নিয়মটি প্রয়োগ করেন। তবে তাঁর বর্গীকরণের মূলে চারটি ভিত্তি ছিল। এইগুলি হল— (১) শিক্ষাগত ভিত্তি, (২) যুক্তিগত ভিত্তি, (৩) মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি, এবং (৪) ক্রমবর্ধিষ্ণু ভিত্তি। প্রথমত এই বর্গীকরণটি শুধুমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়ত, উদ্দেশ্যগুলিকে যুক্তির উপর নির্ভর করে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তৃতীয়ত, উদ্দেশ্যগুলি বিন্যস্ত করার সময় শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আগ্রহের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং চতুর্থত, উদ্দেশ্যগুলি কাঠিন্যের মাত্রানুসারে ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী সজ্জিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে দক্ষতাভিত্তিক নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যগুলি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। এক একটি পর্যায়কে বলে ক্ষেত্র বা Domain। এইরূপ তিনটি ক্ষেত্র হল— (ক) জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র (Cognitive Domain), (খ) অনুভূতিমূলক ক্ষেত্র (Affective Domain) এবং (গ) মনশ্চালক ক্ষেত্র (Psychomotore Domain)। তবে জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যগুলিকে বর্গীকরণের নিয়মে সজ্জিত করেন ব্লুম ও তাঁর সহযোগী গবেষকগণ (১৯৫৬)। অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যগুলিকে বর্গীকরণের মাধ্যমে বিন্যস্ত করেন ক্রথল ও তাঁর সহযোগীগণ (১৯৫৬)। আর মনশ্চালক ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যগুলিকে বর্গীকরণ সূত্রের ভিত্তিতে সজ্জিত করেন হ্যারো (১৯৭২)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রতিটি ক্ষেত্র আবার কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত। এগুলি নিম্নে উচ্চস্তর অনুযায়ী ছকের সাহায্যে উল্লেখ করা হল—

জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র	অনুভূতিমূলক ক্ষেত্র	মনশ্চালক ক্ষেত্র
মূল্যায়ন	চরিত্রায়ন	উদ্ভাবন
↑	↑	↑
সংশ্লেষণ	সংগঠন	অভিযোজন
↑	↑	↑
বিশ্লেষণ	গুরুত্ব প্রদান	জটিল প্রতিক্রিয়া
↑	↑	↑

Scanned by CamScanner

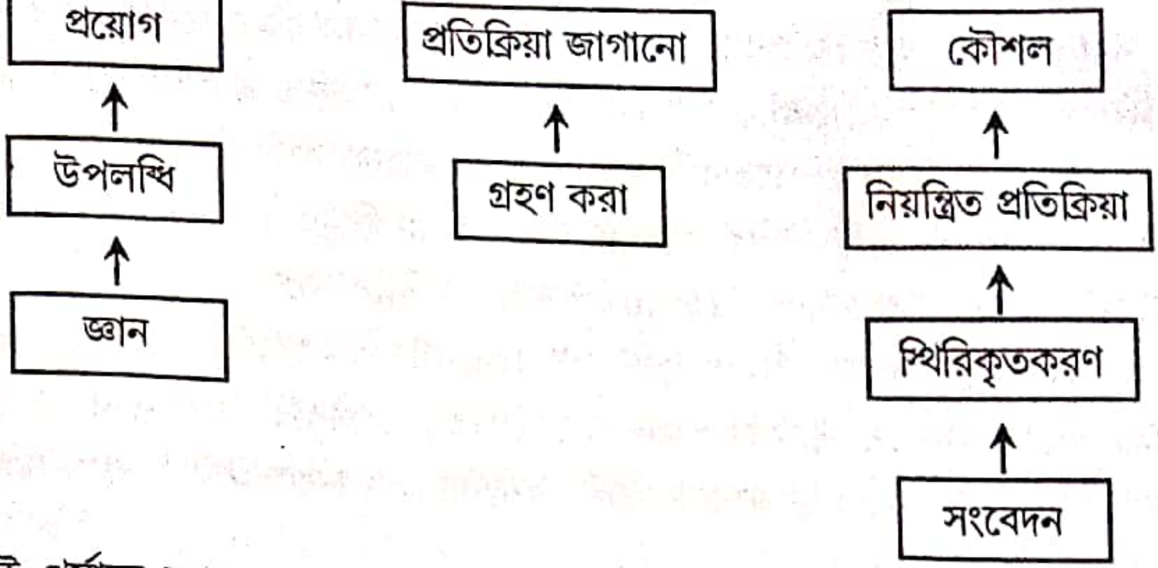

এই পর্যায়ে জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র, অনুভূতিমূলক ক্ষেত্র এবং মনশ্চালক ক্ষেত্র সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

ঃ জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র **(Cognitive Domain)**— জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যগুলিকে কাঠিন্যের মাত্রানুযায়ী ছয়টি ক্রমোচ্চশীলতার ভিত্তিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি উদ্দেশ্য তার আগের উদ্দেশ্যটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ফলে পূর্বের উদ্দেশ্যটি অর্জন করতে পারলে তবেই পরের উদ্দেশ্যটিতে উপনীত হতে পারবে। অর্থাৎ পরবর্তী উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে তার অগ্রবর্তী উদ্দেশ্যটিকে অর্জন করতে হবে। এই পর্যায়ে যে ছয়টি দিক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেগুলি হল— (i) জ্ঞান (Knowledge), (ii) উপলব্ধি (comprehension), (iii) প্রয়োগ (application), (iv) বিশ্লেষণ (analysis), (v) সংশ্লেষণ (Synthesis) এবং (vi) মূল্যায়ন (evaluation)। বর্গীকরণের জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধিষ্ণু স্তরগুলি নিম্নে ছকের সাহায্যে দেখানো হল।

সর্বোচ্চস্তর	জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র	ক্রমপুঞ্জিত উর্ধ্বক্রম
↑	মূল্যায়ন (E)	K+C+AP+AN + SN + E
	সংশ্লেষণ (SN)	K+ C+AP +AN +SN
	বিশ্লেষণ (AN)	K +C +AP+AN
	প্রয়োগ (AP)	K+ C+ AP
	উপলব্ধিমূলক (C)	K+ C
	জ্ঞানমূলক (K)	K
সর্বনিম্নস্তর		

এইক্ষেত্রে ক্রমপুঞ্জিত উর্ধ্বক্রমটি লেখার কারণ হল কোনো একটি উদ্দেশ্য অর্জন আয়ত্ত করার জন্য তার পরের বা নিম্নের উদ্দেশ্যটি আগে অর্জন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, উপলব্ধিমূলক (C) স্তরের আয়ত্ত করতে হলে জ্ঞানমূলক (K) স্তরের উদ্দেশ্যটি আগে অর্জন করতে হবে। তাই লেখা হয়েছে K+C। অনুরূপভাবে বিশ্লেষণমূলক (AN)

Scanned by CamScanner

স্তরটি অর্জন করতে হলে যে স্তরগুলি তার পূর্বে অর্জন করা দরকার তা হল— জ্ঞানমূলক (K), উপলব্ধিমূলক (C) এবং প্রয়োগমূলক AP। সেজন্য এই পর্যায়ে লেখা হল (K+C+AP+AN) ইত্যাদি। প্রত্যেকটি স্তর নিম্নে আলোচনা করা হল —

(i) জ্ঞান **(K)**— এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হল মূর্ত বা বিমূর্ত কোনো কিছু স্মরণ করা, কোনো প্রক্রিয়া জানা, কোনো পদ (term), পদ্ধতি ও নীতি মনে রাখা ইত্যাদি। বিশেষত স্মরণ প্রক্রিয়ার দুটি উপাদান অর্থাৎ পুনরুদ্রেক (recall) ও প্রত্যাভিজ্ঞা (recognition) এই স্তরে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। পড়া, সেমিনার, আলোচনা, সাক্ষাৎকার ইত্যাদির মাধ্যমে এই স্তরের উদ্দেশ্যকে অর্জন করা যায়। জ্ঞানকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই তিনটি ভাগ হল—

(ক) নির্দিষ্ট জ্ঞান (Knowledge of specific)— এই পর্যায়ের অংশ হল নীতি, ধারণা, সূত্র, পদ, চিহ্ন ইত্যাদি চিনতে পারা বা স্মরণ করা। এইক্ষেত্রে উদাহরণ হল ঃ আর্কিমিডিসের সূত্রটি বর্ণনা করো, নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটি উল্লেখ করো, কেন্দ্রীয় প্রবণতার ধারণাটি ব্যক্ত করো ইত্যাদি।

(খ) পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান (Knowledge of methodology)— জ্ঞানের সংগঠন ও বিচারকরণের পদ্ধতি বা কৌশল হল এর আওতাভুক্ত। উদাহরণ— আলোর প্রতিসরণের সূত্রটি পরীক্ষা করো, পরীক্ষার সাহায্যে আর্কিমিডিসের সূত্রটি প্রমাণ করো, ওজাইভ অঙ্কনের পদ্ধতিটি বর্ণনা করো ইত্যাদি।

(গ) বিমূর্তজ্ঞান (Knowledge of abstract)- তত্ত্ব, নীতি, সামান্যীকরণ করা ইত্যাদি হল এর অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ— 'তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বস্তুর প্রসারণ ঘটে' নীতির উপর ভিত্তি করে থার্মোমিটারের কার্যপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত, আপেক্ষিক তাপ অনুপাত হওয়ায় এর কোনো একক নেই, জলের ব্যতিক্রান্ত প্রসারণের ফলে শীতপ্রধান দেশে সমুদ্রের জল জমে বরফ হলে জলচর প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে ইত্যাদি।

(ii) উপলব্ধি **(C)** — এই স্তরে প্রত্যাশা করা হয় যে শিক্ষার্থীরা কোনো তত্ত্ব, তথ্য, বস্তু ইত্যাদি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা গঠন করতে সমর্থ হবে। ফলে এই প্রকার উদ্দেশ্যে তখনই উপনীত হতে পারবে যদি তারা অনুবাদ করতে সমর্থ হয়, ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা অর্জন করে এবং সূত্র বা ধারণা বলতে সক্ষম হয়। দলগত আলোচনা, হাতে কলমে কাজ, সংক্ষেপকরণ, বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মাধ্যমে এই স্তরের উদ্দেশ্যকে আয়ত্ত করা যায়। উপলব্ধিকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই তিনটি ভাগ হল—

(ক) অনুবাদকরণ (Translation)— এই স্তরে শিক্ষার্থীরা কোনো ধারণাকে সংকেতের সাহায্যে প্রকাশ করতে সমর্থ হবে বা কোনো সংকেতকে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে সক্ষম হবে। উদাহরণ—"ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হল বংশগতি ও পরিবেশের গুণফলের অপেক্ষক (function)"। এই পর্যায়ে অনুবাদকরণের উদ্দেশ্যটি তখনই অর্জন করতে পারবে যদি

Scanned by CamScanner

শিক্ষার্থী উপরোক্ত ধারণাটিকে সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়। উপরোক্ত ধারণাটিকে প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করলে হবে $P=f(H \times E)$, যেখানে P = ব্যক্তিত্ব, H = বংশগতি এবং E =পরিবেশ।

(খ) বিশদীকরণ (Interpretation)– এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা কোনো ধারণাকে **নিজের মতো** করে ব্যাখ্যা দিতে পারে কিংবা বর্ণনা করতে পারে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে কোনো ধারণাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন, পুনর্গঠন বা পুনর্বিন্যস্তকরণ হল এই প্রকার উদ্দেশ্যের অন্যতম দিক। উদাহরণ— সততা, চরিত্র, সুনাগরিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে বর্তমান সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন।

(গ) বহির্পাতন (extrapolation)– কোনো ধারণার মূল বক্তব্যকে **অবিকৃত রেখে** তার সম্প্রসারণ ঘটানো বা অর্থ বলা। উদাহরণ— মূল্যবোধ, দেশপ্রেম ইত্যাদির অর্থকে বিকৃত না করে পরিস্ফুট করতে সমর্থ হওয়া।

(iii) **প্রয়োগ (AP)**– প্রথম স্তরের জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় স্তরের উপলব্ধিমূলক উদ্দেশ্য অর্জন করতে সমর্থ হলেই তবেই শিক্ষার্থীরা তৃতীয় স্তরে নতুন পরিস্থিতিতে তার প্রয়োগ করতে সমর্থ হবে। মূলত অর্জিত এবং তৎসহ উপলব্ধ জ্ঞান, দক্ষতা, ও কৌশল বাস্তব অবস্থায় প্রয়োগ করতে পারা এই প্রকার উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ— আর্কিমিডিসের সূত্র সম্পর্কে ধারণা গঠন করা সম্ভব হলে নিম্নের প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে। **জাহাজ জলে ভাসে কেন?** এই ধরনের উদ্দেশ্যকে আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগুলি হল— আলোচনা, পরীক্ষাগারের কাজ ইত্যাদি।

(iv) বিশ্লেষণ (AN)— এই স্তরের উদ্দেশ্য হল কোনো বিষয়ের বিভিন্ন অংশ জানা এবং তা বিশ্লেষণ করতে পারা। অর্থাৎ কোনো বিষয় বা ঘটনাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে তার প্রত্যেকটি অংশের ব্যাখ্যা প্রদান ও অংশগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে সমর্থ হওয়া। তবে বিশ্লেষণমূলক উদ্দেশ্যেরও কতকগুলি বিভাগ রয়েছে যেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল—

(ক) উপাদানের বিশ্লেষণ (Analysis of elements) — উপাদান বিশ্লেষণ হল কোনো ধারণার মধ্যে অবস্থিত উপাদানগুলির বিস্তৃতিকরণ। উদাহরণ — (১) 'সমত্বরণে ঋজুগতি সম্পন্ন বস্তুকণা কর্তৃক অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করা হবে'। এই ক্ষেত্রে বস্তুকণা কর্তৃক অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় (s) করতে হলে প্রারম্ভিক বেগ (u), ত্বরণ (f) এবং সময় (t) সম্পর্কে ধারণা গঠন করতে হবে। শিক্ষার্থী এইগুলি জানলে বা অংশগুলিকে পৃথক করতে পারলে সে 't' সময় পরে বস্তুকণা কর্তৃক অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করতে এবং সূত্রাকারে অর্থাৎ $(s) = ut+\frac{1}{2}ft^2$-এর আকারে প্রকাশ করতে সমর্থ হবে। উদাহরণ (2)—'বিন্যস্ত রাশিমালা থেকে গড় নির্ণয় করা হবে'। এই পর্যায়ে গড় নির্ণয় করতে হলে কল্পিত গড় (A), স্কোর সংখ্যা (N), শ্রেণি ব্যবধান (i), পরিসংখ্যা (f) এবং গড় থেকে স্কোরের বিচ্যুতি (d) সম্পর্কে

Scanned by CamScanner

ধারণা গঠন করতে হবে। শিক্ষার্থী এইগুলি জানলে বা অংশগুলিকে পৃথক করতে পারলে শিক্ষার্থী বিভিন্ন অংশগুলি সূত্রাকারে অর্থাৎ গড় $(M)=A+(\Sigma fd / N)\times i$-এর আকারে প্রকাশ করতে এবং বিন্যস্ত রাশিমালার গড় নির্ণয় করতে সমর্থ হবে।

(খ) সম্পর্কের বিশ্লেষণ (Analysis of relationship)— এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা পূর্বের বিশ্লেষণীকৃত অংশগুলির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করতে সমর্থ হবে। ফলে সম্পূর্ণ অংশের সঙ্গে তার খণ্ড খণ্ড অংশগুলি কীভাবে সম্পর্কযুক্ত তা অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। উদাহরণ— এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা দূরত্ব (s)-এর সঙ্গে প্রারম্ভিক বেগ (u), সময় (t) এবং ত্বরণ (f)-এর যে সম্পর্ক আছে তা তারা বুঝতে পারবে। কিংবা গড়ের (M) সাথে কল্পিত গড় (A), পরিসংখ্যা (f), বিচ্যুতি (d), মোট স্কোর সংখ্যা (N) এবং শ্রেণিব্যবধান (i)-এর সম্পর্ক বিদ্যমান তা অনুধাবন করতে পারবে।

(গ) সাংগঠনিক নীতির বিশ্লেষণ (Analysis of organisational principles)— এই স্তরে কোনো ধারণার মধ্যে যে নীতি, সূত্র ইত্যাদি নিহিত রয়েছে তার সংগঠনটি উপলব্ধি করা এবং ধারাবাহিক বিন্যাসটি বোঝা। এই উদ্দেশ্যটি বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় কেসস্ট্যাডি দলগত আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে। উদাহরণ— সরল সুদ নির্ণয়ের ধারণার উপর ভিত্তি করে যৌগিক সুদ (compound interest) নির্ণয় করার ধারণা অর্জন করবে। অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে আসল টাকার সুদ নির্ণয় করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে যৌগিক সুদের ক্ষেত্রে সরল সুদ আসলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সুদ নির্ণয় করা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে আসলের সাথে দ্বিতীয় পর্যায়ে সুদ যোগ করে সুদ নির্ণয় করা হয়, এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে। ফলে শিক্ষার্থীরা এইভাবে যৌগিক সুদ নির্ণয়ের সংগঠনটি উপলব্ধি করতে পারে এবং ধারাবাহিক বিন্যাসটি বুঝতে পারে।

(v) সংশ্লেষণ (SN)—এই স্তরের উদ্দেশ্য হল কোনো বিষয়ের বিন্যস্ত বা বিশ্লেষিত বিভিন্ন অংশগুলি সমন্বিত করা। এই পর্যায়ের উদ্দেশ্যের বিভিন্ন বিভাগগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল—

(ক) অনন্য যোগসাধনের ব্যবস্থা (Production of unique communication)- এই ধরনের উদ্দেশ্যের ফলে শিক্ষার্থী নিজের চিন্তাধারা বা অভিজ্ঞতা অপরের কাছে ব্যক্ত করতে সমর্থ হয়। উদাহরণ—ভারতীয় সংবিধানে সাম্যের অধিকার-এর ধারণা অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

(খ) কর্মসম্পাদনের প্রকল্প প্রস্তুত করা (Production of a proposed set of operations)— কোনো কার্য সম্পাদনের জন্য পরিকল্পনা রচনা করার দক্ষতা অর্জন করা এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ—পরীক্ষাগারে অক্সিজেন প্রস্তুতির যন্ত্রপাতিগুলি সঠিকভাবে বিন্যস্ত ও সংযোগ করা।

(গ) বিমূর্ত সম্পর্ক স্থাপন (Derivation of a set of abstract relations)– এখ

Scanned by CamScanner

কোনো তথ্য বা ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য উক্ত তথ্য বা ঘটনার বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিমূর্ত সম্পর্ক স্থাপন করা। উদাহরণ— যেহেতু পরমানুর গঠন একটি বিমূর্ত ধারণা, তাই যে কোনো একটি পরমাণুর ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে সম্পর্ক তুলে ধরার মাধ্যমে এই প্রকারের উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে।

(vi) মূল্যায়ন (E) – কোনো বিষয় বা বস্তুর গুণাগুণ বিচার করা এই প্রকার উদ্দেশ্যের পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ কোনো ধারণা, কাজ, বস্তু, পদ্ধতি ইত্যাদির গুণগত মান বিচার করাই হল এই প্রকার উদ্দেশ্যের কাজ। কিংবা একটি নির্দিষ্ট মানের ভিত্তিতে কোনো বিষয় যাচাই করা এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। বিশেষত জটিল মানসিক প্রক্রিয়ার বিচারকরণই হল এর মূল নিশানা। সাধারণত সমালোচনা, মন্তব্য, বিতর্ক ইত্যাদির ভিত্তিতে এই প্রকার উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়া যায়। তবে এই ধরনের উদ্দেশ্যেরও কয়েকটি ভাগ আছে। সেগুলি হল—

(ক) অভ্যন্তরীণ প্রমাণের দ্বারা মূল্যায়ন (Evaluation through internal evidence)– এই প্রকার উদ্দেশ্যের ভিত্তি হল যৌক্তিকতা। এখানে যুক্তিসম্মতভাবে নির্ভুল ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে কোনো ঘটনা বিচার করা হয়। উদাহরণ— কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় যুক্তির অভাব থাকলে আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের ফলে তার মান হ্রাস পাবে।

(খ) বাহ্যিক নির্ণায়কের দ্বারা মূল্যায়ন (Evaluation through external criteria)– এই প্রকার উদ্দেশ্য বাহ্যিক শর্তের উপর নির্ভর করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বিজ্ঞান মনস্কতা, সামাজিক মূল্যমান ইত্যাদির ভিত্তিতে এই প্রকার উদ্দেশ্য মূল্যায়ন করা হয়। উদাহরণ— গ্যাসের আয়তন নির্ভর করে চাপ ও তাপমাত্রার উপর। এক্ষণে যদি বলা হয় গ্যাসের আয়তন হল 250CC, তাহলে বক্তব্যটির মধ্যে অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। যতক্ষণ না পর্যন্ত কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ও কত সেমি চাপে গ্যাসের আয়তন 250CC উল্লেখ করা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বক্তব্যটি অর্থহীন। ফলে এখানে চাপ ও তাপমাত্রা হল বাহ্যিক নির্ণায়ক।

অনুভূতিমূলক ক্ষেত্র **(Affective Domain)**– এই উদ্দেশ্যের সাথে সম্পকযুক্ত বিভিন্ন মানসিক দিকগুলি হল—দৃষ্টিভঙ্গি, আবেগ, অনুভূতি, মূল্যবোধ, আগ্রহ ইত্যাদি। বিশেষত অনুভূতিমূলক ক্ষেত্র সেইসব উদ্দেশ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যেগুলি আগ্রহ, প্রতিন্যাস (attitude) ও মূল্যবোধের পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত এবং অভিযোজন ও মূল্যবিচারের বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই পর্যায়ের উদ্দেশ্যগুলি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেকটি ভাগ উদাহরণসহ কাঠিন্য অনুসারে নিম্নে আলোচনা করা হল—

(ক) গ্রহণ করা (Receiving)— কোনো ঘটনা, বক্তব্য বা বিষয় মনোযোগ সহকারে শোনা ও অনুধাবন করা। বিশেষভাবে কৌতূহল, সচেতনতা, গ্রহণ করার মানসিকতা ইত্যাদি হল এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ— স্বেচ্ছায় রক্তদান বিষয়ক প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে পড়।

(খ) প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা (Responding)— এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হল কোনো কার্যক্রম,

Scanned by CamScanner

ঘটনা ও বিষয় সম্পর্কে ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া বা মনোভাব প্রকাশ করা। উদাহরণ—স্বেচ্ছায় রক্তদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা।

(গ) গুরুত্ব প্রদান (Valuing)— এই উদ্দেশ্যটির গুরুত্বপূর্ণ দিক হল কোনো কার্যক্রম, ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে তার গুণাগুণ বিচার করা এবং এর প্রতি অনুকূল আচরণ সম্পন্ন করা। উদাহরণ— মানুষের জীবনে রক্তদান কার্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। উক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা হল এই প্রকার উদ্দেশ্যের একটি নমুনা।

(ঘ) সংগঠন (Organisation)– এই স্তরে পূর্বের স্তরগুলির ভিত্তিতে যে মূল্যবোধগুলি তৈরি হয় সেগুলি আরও সুসংবদ্ধ আকার লাভ করে। অর্থাৎ বিভিন্ন মূল্যবোধগুলির মধ্যে বিভেদের সীমারেখা বা বৈরিতা দূরীভূত হয়। আবার সেগুলির মধ্যে যেমন একদিকে একটি সম্পর্ক রচিত হয়, তেমনি অন্য দিকে সেগুলি সম্পর্কে ধারণাও সুদৃঢ় হয়। ব্যক্তির নিজস্ব মূল্যবোধ সুদৃঢ়ভাবে সংবন্ধকরণ হল এই প্রকার উদ্দেশ্যের উদাহরণ।

(ঙ) মূল্যবোধভিত্তিক বৈশিষ্ট্য (Characterization by a value)– ব্যক্তির মধ্যে যে মূল্যবোধ রয়েছে তা তার আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে তা অভ্যাসে পরিণত হয় এবং এরই দ্বারা ব্যক্তি পরিচালিত হয়। বিশেষত এইরূপ উদ্দেশ্যে ব্যক্তির জীবনাদর্শের সঙ্গে সংপৃক্ত। সম্মান রক্ষার্থে কারুর সাথে তর্ক না করে এড়িয়ে চলা হল এই প্রকার উদ্দেশ্যের উদাহরণ।

মনশ্চালকমূলক ক্ষেত্র (Psychomotor Domain) : উদ্দেশ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই মাত্রাটি (domain) বিশেষত স্নায়বিক ও পেশিমূলক দক্ষতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে এ কথা স্পষ্ট যে কোনো কাজ মনকে বাদ দিয়ে যথাযথভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। তাই এই মাত্রাটির নামকরণ করা হয়েছে মনশ্চালকমূলক ক্ষেত্র। মূলত মনের সঙ্গে স্নায়ু ও পেশির মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কোনো কাজ সম্পন্ন হয় বলে এই প্রকার উদ্দেশ্যকে বলা হয় মনশ্চালকমূলক উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গত স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে স্নায়ু ও পেশির মধ্যে সমন্বয়ন যত ভালো হবে সঞ্চালন দক্ষতাও তত বৃদ্ধি পাবে। তাই এই প্রকার ক্ষেত্রের ভিত্তিগুলি হল —দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা, মাংসপেশির সক্রিয়তা বৃদ্ধি করা, স্নায়বিক সংযোগসাধন করা, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন ঘটানো ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে বাদ্যযন্ত্র বাজানো, টাইপ করা, যন্ত্র চালানো, কর্মশিক্ষার বিভিন্ন কাজ ইত্যাদি মনশ্চালকমূলক দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। মনশ্চালকমূলক ক্ষেত্রের শ্রেণিকরণ বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বিভিন্নভাবে করেছেন। যেমন—Dr. R.H.Dave (1968) পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। এই ভাগগুলি কাঠিন্যমাত্রার স্তর অনুযায়ী হল যথাক্রমে অনুসরণ (imitation), হস্তচালনা (manipulation), নিখুঁতায়ন (Precision), গ্রন্থনা (Articulation) এবং স্বাভাবিকীকরণ (Naturalisation). E.J.Simpson (1972) যে সমস্ত স্তরে এই ক্ষেত্রটিকে যেভাবে সজ্জিত করেন, তা হল—সংবেদন, স্থিরিকৃতকরণ, নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া

Scanned by CamScanner

কৌশল, জটিল প্রতিক্রিয়া, অভিযোজন ও উদ্ভাবন। আবার A.J.Harrow (1972) এই পর্যায়ে যে পাঁচটি স্তরের কথা উল্লেখ করেন তা হল—প্রত্যক্ষণ, সেট, নির্দেশিত প্রতিক্রিয়া, যান্ত্রিক কৌশল এবং বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া। এই পর্যায়ে দাভে প্রদত্ত মডেলটি উল্লেখ করা হল।

(i) অনুকরণ (Imitation) ঃ মনশ্চালক ক্ষেত্রের সর্বনিম্ন পর্যায়টি হল অনুকরণ। এই পর্যায়ে কোনো কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে পেশির মধ্যে সমন্বয় সাধনের কোনো প্রয়োজন হয় না। শিশু সুপ্তভাবে তা অনুকরণ করে। স্নায়ু ও পেশির দ্বারাই তা কেবলমাত্র সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই এই প্রকার কর্ম স্থূল প্রকৃতির হয়।

(ii) হস্তচালনা (Manipulation) ঃ ক্রমোচ্চ স্তরের দ্বিতীয় পর্যায়টি হল হস্তচালনা। আদেশ বা নির্দেশনা অনুযায়ী কোনো কাজ শিশুরা সম্পন্ন করে থাকে। বিশেষত প্রয়োজনমাফিকতার দিকে লক্ষ রেখে শিশুদেরকে কর্মসম্পাদনে উৎসাহিত করা হয়। প্রথম স্তর অনুকরণের মতো এই স্তরটি নিষ্ক্রিয় নয়। সচেতনতা ও সক্রিয়তার মাধ্যমে শিশুরা এই স্তরের কাজ পরিচালনা করে থাকে। এ ছাড়া কোনো কাজে পেশি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও পরিলক্ষিত হয়।

(iii) নিখুঁতায়ন (Precision) ঃ খুঁটিনাটি কাজ দ্রুত ও নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয় এই স্তরে। এটি হল মনশ্চালক মাত্রার তৃতীয় স্তর। শিশুদের কোনো কাজের উৎকর্ষতার উপর সবিশেষ নজর দেওয়া হয়। এর জন্য যে ধরনের আত্মবিশ্বাস ও সতর্কতার প্রয়োজন হয় তা শিশুরা আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়। ফলে তারা কাজের মধ্যে খুব সহজেই বৈচিত্র্য আনতে পারে বা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। এই পর্যায়ের কর্মসম্পাদনে কোনো প্রকার মডেল বা নির্দেশনার প্রয়োজন হয় না।

(iv) গ্রন্থনা (Articulation) ঃ এই স্তরে শিক্ষার্থীরা কোনো কাজ ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করতে সমর্থ হয় এবং বিভিন্ন ধরনের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতেও সক্ষম হয়। তার ফলে শিশুরা দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন ঘটাতে এবং ব্যবহার করতে পারে। এমনকি তারা দেহের বিভিন্ন অংশগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং এদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারে।

(v) স্বাভাবিকীকরণ (Naturalisation) ঃ এই স্তরে কোনো কাজ বার বার সম্পাদন করতে গিয়ে তা স্বাভাবিক পর্যায়ে উন্নীত হয়। অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরবর্তী ক্ষেত্রে তা ঘটে থাকে। ন্যূনতম মানসিক শক্তি ক্ষয় করে অচেতনভাবে কাজটি সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়। মূলত মনশ্চালক ক্ষেত্রের সর্বশেষ মাত্রায় এইরূপ আচরণ সম্পন্ন হয়ে থাকে। তবে মনে রাখা দরকার যে কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হলেই এইরূপ স্বাভাবিকীকরণ সম্ভব।

পাঠক্রম চর্চায় বর্গীকরণের গুরুত্ব ঃ নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যের তিনটি ক্ষেত্র একেবারে পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। শিশুর আচরণ কোনো অবস্থাতেই বিশেষ একটি ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশুর আচরণের বিকাশ তিনটি ক্ষেত্রের মাধ্যমে নিরূপিত করতে না পারলে তার সম্পর্কে অনেক তথ্যই অজানা থেকে যাবে। তাই তিনটি ক্ষেত্র একে

Scanned by CamScanner

... হলে তিনটি ক্ষেত্রেরই প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে গীটার বাজানোর জ্ঞান (Cognitive) না থাকলে এবং বাজানোর ইচ্ছা (Affective) না জাগলে যথাযথভাবে গীটার বাজানো (Psychomotor) সম্ভব নয়। কারণ গীটার বাজানোর নিয়ম হল জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। আবার গীটার বাজানোর ইচ্ছা বা আগ্রহ হল অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রের অংশ। অন্যদিকে গীটার বাজানোর দক্ষতা মনশ্চালকমূলক ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। ফলে পাঠক্রম চর্চায় এক একটি ক্ষেত্রকে বিচ্ছিন্ন হিসাবে বিবেচনা না করে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে হবে। তবেই নির্বাচিত পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে উচ্চস্তরের সাফল্য অর্জন করানোর ক্ষেত্রে সফল হওয়া যাবে। পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুভূতিমূলক ও মনশ্চালকমূলক ক্ষেত্রের প্রতি প্রাধান্য না দিয়ে শুধুমাত্র জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করলে তা গতানুগতিক পাঠক্রমে পর্যবসিত হবে। কোনো সময়েই এইরূপ পাঠক্রম যান্ত্রিকতার উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হবে না। তাই জ্ঞানমূলক, অনুভূতিমূলক ও মনশ্চালকমূলক-এর প্রতি নজর রেখে পাঠক্রম উন্নয়নের উদ্দেশ্য গঠন করা সম্ভব হলে, সেই পাঠক্রমের কার্যকারিতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া পাঠক্রমের মধ্যে কী কী বিষয় (subject) এবং বিষয়বস্তু (Content) বা অভিজ্ঞতা সংযুক্ত করতে হবে তারও নির্দেশনা পাওয়া সম্ভব ব্লুমের বর্গীকরণ থেকে। কারণ কোনো বিষয়ের

পাঠক্রম চর্চায় বর্গীকরণের গুরুত্ব

একক অভিজ্ঞতা বা বিষয়বস্তু নির্বাচন, শ্রেণিকরণ এবং বিন্যস্তকরণের পূর্বে যদি নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায় বা গঠন করা সম্ভব হয়, তাহলে এইসব কাজ অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়বে। ব্লুম কর্তৃক উদ্দেশ্যের বর্গীকরণ আমাদেরকে এই ক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করবে। উদ্দেশ্যের বর্গীকরণ পাঠক্রম চর্চায় কীভাবে সাহায্য করে তার কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হল—

১। শিক্ষার্থীর বিকাশের বৌদ্ধিক, অনুভূতিমূলক এবং মনশ্চালক ক্ষেত্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে সেই অনুযায়ী শিক্ষাক্রমকে পরিচালনা করা যায়।

২। এর ভিত্তিতে নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা এবং সেই অনুযায়ী বাস্তবভিত্তিক ও যুক্তিসঙ্গত পাঠক্রম উন্নয়ন ও পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচন সহজ হয়ে পড়ে।

৩। শিক্ষার্থীর বিকাশ সাধনে কোন কোন অভিজ্ঞতা অধিকতর প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে সেই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া সম্ভব।

৪। পাঠদান কালে কিরূপ পরিবেশ বা পরিস্থিতি এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে তা জানা সম্ভব হবে এর মাধ্যমে।

৫। বর্গীকরণের ভিত্তিতে উদ্দেশ্য নির্ধারণ যুক্তিগ্রাহ্যভাবে সম্ভব হয় বলে তার মাধ্যমে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচন ও বিষয়বস্তুর যথার্থতা বিচারকরণ সহজসাধ্য হয়।

৬। শিক্ষার্থীর বিকাশ ও বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রেখে পাঠক্রম প্রণয়ন করা সম্ভব হয়।

৭। উদ্দেশ্যগুলির ভিত্তিতে আদর্শ শিক্ষামূলক পরিবেশ গঠন করা সম্ভব।

৮। এইরূপ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে পাঠক্রম প্রণয়ন করে সমগ্র শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে বিন্যস্ত করা সম্ভব।

Scanned by CamScanner